Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোজী আফরোজ আঁখি

রোলঃ 227022350

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোজী আফরোজ আঁখি

রোলঃ 227022350

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুমিনের গুণ ও মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রোজী আফরোজ আঁখি, আইডিঃ 227022350 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুমিনের গুণ ও মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

রোজী আফরোজ আঁখি

আইডিঃ 227022350

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

মুমিনের পরিচয়

মুমিন আরবী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাসকারী বা বিশ্বাসী। আর পারিভাষিক অর্থে মুমিন হল ছয়টি বিষয়ের উপর তথা "আল্লাহর ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবের উপর, সকল নবী- রাসূলদের ওপর, পরকালে পুনরুত্থিত হওয়ার উপর এবং লিপিবদ্ধ তাকদীরের উপর" যে ব্যক্তি কোন প্রকার সন্দেহ-প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস করে, তাকেই মুমিন বলা হয়। এ প্রসঙ্গে জিবরাঈল (আ.) নবী (স.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন-

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. (بخارى ومسلم)

"আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখেরাতের দিনের প্রতি এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি তোমরা ঈমান আনো"। এক কথায় বলতে গেলে মুমিন তাকেই বলা হয় যে (প্রাথমিকভাবে(غَيْبِ ً)অদৃশ্য(এর প্রতি বিশ্বাসী হয়। হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে একটি ছাড়া বাকি পাঁচটি কখনই غَيْبِ ً)অদৃশ্য) মুক্ত ছিল না। একটি বিষয় কিছু সময়ের জন্য غيب)অদৃশ্য) মুক্ত ছিল।

আর তা হলো- নবী-রাসূলগণ অর্থাৎ যখন নবী-রাসূলগণ ছিলেন তখন লোকেরা তাঁদেরকে দৃশ্যমান অবস্থায় দেখতে পেত। কিন্তু এখন ছয়টি বিষয়ের মধ্যে কোনটিই দৃশ্যমান নয় বরং অদৃশ্য অর্থাৎ দেখা যায় না।

আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলতে গেলে বলা যায়- নবী-রাসূলগণ যে নিজেদের নবী-রাসূল বলে পরিচয় দিয়েছেন এটি সরাসরি আল্লাহ এসে সাক্ষী দিয়ে যাননি। আমরা মহান আল্লাহকে দেখতে পাই না, তাঁর ফেরেশতাদের দেখা যায় না। তাঁর নাযিলকৃত কিতাব বিশেষ করে কোরআন তাঁর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তা আমরা দেখিনি এবং সাহাবীগণও সরাসরি কোরআন নাযিল হচ্ছে এমনটি দেখেননি বরং রাসূলের কাছে নাযিল হয়েছে পরে রাসূল (স.) তাদের নিকট তা উপস্থাপন করতেন। এরপর সাহাবীগণ তা গ্রহণ করতেন পূর্ণ ঈমানের সাথে, পরপারে পা রেখে কেউ পুনরায় জীবন লাভ করেছে আমরা তা দেখিনি এবং ভালো-মন্দ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাও আমরা দেখিনি।

যৌক্তিকতাকে অগ্রাধিকার দিলে বলতে হয়, কোন দৃশ্যমান বিষয়কে বিশ্বাস করতে হবে এর কোন ভিত্তি নেই। আর ভিত্তিহীন কোন কথাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের বলতে পারেন

না। যেমন কেউ আপনার সামনে একটি আপেল এনে বললো বিশ্বাস করুন এটি একটি আপেল। এক্ষেত্রে প্রশ্নের যেমন ভিত্তি নেই, তেমনি বিশ্বাসেরও কোন প্রয়োজন নেই। আবার কেউ হাতের মুঠোয় একটি চাবি লুকিয়ে বললো বিশ্বাস করুন আমার হাতের মুঠোয় একটি চাবি আছে অথচ আপনি জানেন না তার হাতের মুঠোয় কি আছে। এক্ষেত্রেই কেবল আপনার বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাস করলে আপনি তার প্রতি ঈমান আনলেন অর্থাৎ মুমিন হলেন আর অবিশ্বাস করলে ঈমান আনেননি বা মুমিন হননি।

মুমিন তাকে বলা হয় যিনি আল্লাহ তায়ালাকে একইসঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন আবার সবচেয়ে বেশি ভয় পান। একজন মুমিনের ধ্যান-জ্ঞান ইচ্ছা-অভিলাষ সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হবেন এক আল্লাহ। আল্লাহর নির্দেশনাবলী সে এমনভাবে মান্য করবে যেন এটাই তার অভ্যাস—আল্লাহর চাওয়াই তার চাওয়া, আল্লাহকে পাওয়াই তার পাওয়া।

কোনো মানুষ যদি এমন অবস্থানে যেতে পারে, তখন আর্থসামাজিক ক্ষেত্রেও সে ভিন্ন এক মানুষ হয়ে যাবে। তার অন্তরের অন্তস্থলে আপনা আপনিই মানুষের প্রতি মহব্বত ও ইনসাফের মনোভাব তৈরি হবে।

মুমিন অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে

অদৃশ্যে ঈমান আনয়ন মানে- যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুভব করা যায় না, এমন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা। যেমন- আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ওহী, ফেরেশতা, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ সত্যগুলোকে না দেখে বিশ্বাস করা এবং প্রদত্ত খবরের ওপর আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে ঈমান বিলগায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস।

আল কোরআন থেকে কেবল তারাই হেদায়াত লাভ করবে যারা অদৃশ্যমান বিষয়গুলোর ব্যাপারে মুমিন হবে। আর যদি কেউ এমন চিন্তা করে যে, না দেখে, না বুঝে, পরিমাণ বা ওজন না করে, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বাদ-আস্বাদন না নিয়ে তোমার মত কোন জিনিস আমি মেনে নিতে পারি না, তাহলে সে কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না, অদৃশ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস একটি পরীক্ষার মাধ্যম। আর এ পরীক্ষার মেয়াদ গায়েবের পর্দা উন্মোচিত হওয়া পর্যন্ত। গায়েবের পর্দা উন্মোচিত হলে সংশোধনের অবকাশ শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ

তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন-

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ.َ

"তারা বলে, এ নবীর কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন? যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে এতদিনে কবেই ফয়সালা হয়ে যেত, তখন আর তাদের অবকাশই দেয়া হতো না।" (সূরা আল আনআম: ৮)

অর্থাৎ ঈমান আনার ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করার জন্য তোমরা যে সময়-সীমা ও অবকাশ লাভ করেছ এর সময়-সীমা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সত্য অদৃশ্যে রয়েছে। নয়তো অদৃশ্যের পর্দা ছিন্ন হবার সাথে সাথেই এ অবকাশের সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হবে এক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন ছাড়াই এ অদৃশ্য সত্যগুলোকে সত্য বলে অনায়াসেই মেনে নিবে এবং শুধু নিজেই বিশ্বাস করে ক্ষান্ত হবে না বরং অন্যকেও বিশ্বাস করতে উপদেশ দিবে। শুধু তাই নয় কাউকে অস্বীকার করতে দেখলে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্যে)غَيْبِ(বিশ্বাসীদেরকেই মুমিন বলে সার্টিফাই করেছেন অর্থাৎ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে, তারাই কেবল মুমিন বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ- ِ

"এটি এমন একটি কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। হেদায়াত সেই মুত্তাকিদের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল বাকারা: ২-৩)

মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হলো তার মধ্যে মুমিন হতে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন সংশয় থাকতে পারবে না। কেননা, পৃথিবীতে মানুষের পরীক্ষা কেবল মাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে। আর সেটি হল সত্যকে না দেখে সে তাকে মানতে প্রস্তুত কিনা? এবং সত্যকে অমান্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য করার মতো তার নৈতিক শক্তি আছে কি-না? যেমন মূসা (আ.) বিশাল সাপ দেখে দৌড় দিলেন আর আল্লাহ তায়ালা বললেন মূসা ভয় পেয়ো না সাপটি ধর। মূসা (আ.) একটুও দেরি করলেন না আল্লাহ তায়ালা বলার সাথে সাথে সাপ ধরে ফেললেন। এর নাম হল মুমিন।

মুমিন নামাযে বিনয়ী এবং নম্র হবে

মুমিন খুশুর সাথে সালাত আদায় করবে। খুশু শব্দের অর্থ হচ্ছে কারো সামনে ঝুঁকে পড়া, বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থার সম্পর্ক দেহ ও মন দুয়ের সাথেই হবে। মনের খুশু হলো- মানুষ কারও শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব, প্রতাপ ও পরাক্রমশীলতার দরুন তার সামনে সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর অপরদিকে দেহের খুশু হলো- যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনম্র হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত থাকবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে। খুশুর সম্পর্ক মনের সাথে এবং মনের খুশু আপনা-আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়। নামাযে খুশু বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীস শরীফে এসেছে- একদা নবী করীম (স.) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নাড়াচাড়া করতে দেখে বললেন, "যদি তার মনে খুশু থাকত তাহলে তার দেহেও খুশুর সঞ্চার হতো।"

"আমি একনিষ্ঠভাবে মুখ ফিরালাম সেই মহান সত্তার দিকে যিনি ঐ আকাশ আর যমীনের সৃষ্টিকর্তা।" (সূরা আল আনআম: ৭৯)

অর্থাৎ, মুমিন যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং কালব সবই এক আল্লাহর জন্যই হয়ে যেতে হবে। মুমিন নামায পড়বে আর ভাববে-মনে করবে, আমি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান, আমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি। অন্ততপক্ষে এতটুকু ভাবতে হবে বা মনে করতে হবে আল্লাহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

মুমিন অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে

অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন কথা ও কাজ যাতে কোন ফল পাওয়া যায় না যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয় এবং উদ্দেশ্যও ভাল নয়। যেগুলোর আসলে প্রয়োজন নেই, না বললেও চলে। যার কারণেই একজন মুমিন সকল প্রকার অনর্থক এবং বাজে কাজ থেকে দূরে থাকবে এবং এটি তার ঈমানের দাবিও বটে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে বর্ণিত রয়েছে-

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا-

"এবং তারা (মুমিনরা) অর্থহীন বাজে ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে নিজ মর্যাদা রক্ষা করে তা পরিহার করে চলে যায়।" (সূরা আল ফুরকান: ৭২) একজন মুমিনের সম্মান-মর্যাদা অপরিসীম, অনর্থক কথা ও কাজ তার মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মূল্যহীন কোন কথা বা কাজ নিজের মধ্যে আনতে পারে না। মুমিনগণ সর্বদা সময়ের মূল্য দেয় এবং দায়িত্ব পালনে সর্বদা সজাগ থাকে। সে এ দুনিয়ার জীবনকে একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র মনে করবে। একজন ছাত্র যখন পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিচ্ছে সে তখন মনে করে তার পরীক্ষার হলের প্রতিটি মুহূর্ত তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী। এ অনুভূতির কারণে সে প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্ন পত্রের সঠিক উত্তর লেখার চেষ্টায় ব্যয় করে। সে একটি মুহূর্তও বাজে কাজে ব্যয় করে না। ঠিক তেমনি একজন মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনকালকে এমনভাবে পরিচালনা করে যা পরিণামের দিক দিয়ে ইহকালীন

কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হয়। মুমিন হয় একজন শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। সে সর্বদা ফলদায়ক কথা ও কাজ করে চলে এবং আজে-বাজে, গল্প-গুজব করা তাঁর স্বভাব হতে পারে না। সে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও হালকা পরিহাস (সত্যের সাথে মিল রেখে) পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল মুমিনকে জান্নাতে অনেক নেয়ামতের অধিকারী করবেন তার মধ্যে অন্যতম হলো সেখানে তাদেরকে কোন প্রকার বাজে কথা শুনাবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لاغية-

"সেখানে তারা (মুমিনরা) কোন বাজে কথা শুনবে না।" (সূরা গাশিয়া: ১১)

আল্লাহ তায়ালা যে আচরণকে জান্নাতের নেয়ামত হিসেবে বর্ণনা করেছেন, মুমিন সে নেয়ামতের বিপরীত কোন আচরণ দুনিয়ায় করতে পারে না।
মুমিন প্রতিটি কাজ আর কথার পূর্বে চিন্তা করে আমার তো প্রতিটি কাজ ও কথা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং হাশরের ময়দানে সবকিছু আমার সামনে উপস্থিত করা হবে আর হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه.
"অতঃপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা আয যিলযাল: ৭-৮)

মুমিন তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করে

বিশ্বনবী (স.) বলেছেন- "কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিবে না।" (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ)

লজ্জাস্থানের হেফাযত কেবলমাত্র প্রবৃত্তির বাসনা থেকে দূরে থাকা নয়, নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। হযরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী (স.) বললেন "তুমি কি জানো না রান ঢেকে রাখার জিনিস?" কেবল অন্যের সামনে নয় একান্তেও উলঙ্গ থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন-

أَيَّاكُمْ وَالتَّعَرَّى فَإِنْ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَأَكْرِمُوْهُمْ. "সাবধান কখনো উলঙ্গ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সত্তা আছে যারা

কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা), তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া। কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো, তাদের সম্মান করো।" (তিরমিযী)

শরীয়তে পুরুষের ন্যায় নারীদের ব্যাপারে দৃষ্টি সংযমের ব্যাপারে বিধান বিদ্যমান রয়েছে। তারা পুরুষের মতোই ভিন্ন পুরুষদের দেখতে পারবে না। একদা হযরত উম্মে সালামাহ ও হযরত উম্মে মাইমুনাহ নবী (স.) এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম এসে গেলেন। তখন নবী (স.) উভয় স্ত্রীকে বললেন: তাঁর থেকে পর্দা করো। স্ত্রীদ্বয় বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল (স.) তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না; রাসূল (স.) তখন বললেন: 'তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?' (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

সুতরাং মুমিন নারী হোক অথবা পুরুষ হোক সে কোরআন ও হাদীসের ভাষ্যমতে পর্দা অবলম্বন করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে বলেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن

اللَّ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُوْن.

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِن.

"(হে নবী) মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে

রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটি তাদের জন্য বেশি

পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। (হে নবী) মুমিন

মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য বেশি

পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। (হে নবী) মুমিন মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে আর তাদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।" (সূরা আন নূর: ৩০-৩১)

এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর একাধিক হাদিস রয়েছে।
যেমন
وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (رَضى) قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرِ الفُجَاءَةَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرَفُ بَصَرَك- َ

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোন মহিলার ওপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কি করতে হবে? রাসূল (স.) আমাকে নির্দেশ দিলেন

যে, 'তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নিবে।" (মুসলিম)

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَان.ُ

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন: "মহিলারা হল পর্দায় থাকার বস্তু, সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপক্ষো করে) বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সু-সজ্জিত করে দেখায়।" (তিরমিযী) মহিলারা হলো, পেঁয়াজের ন্যায়। পেঁয়াজের খোসা ফেলে দিলে যেমন পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায় দুই/তিন দিনের মধ্যে এবং তা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। অনুরূপভাবে মহিলারা যদি বেপর্দা হয়ে যায় তখন পেয়াজের ন্যায় আত্ম-মর্যাদা হারিয়ে সমাজের নিন্দনীয় শ্রেণীতে পরিণত হয়। যার ফলে সমাজ দূষিত হয়ে যায়, নেমে আসে অসুস্থ পরিবেশ।

মুমিন নিজের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হয়

পবিত্র কোরআনুল কারীমে নিজেদের নামাযে 'বিনয় নম্র' আলোচনায় নামায শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর নিজেদের নামাযে যত্নবান আলোচনায় নামায শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। উভয়ের মধে পার্থক্য হলো নিজেদের নামাযে 'বিনয়-নম্র' আলোচনা দ্বারা মূল নামাযকে বুঝানো হয়েছে। আর নিজেদের নামাযে যত্নবান আলোচনা দ্বারা পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের কথা বুঝানো হয়েছে।

নামাযসমূহের সংরক্ষণ বা যত্নবান এর মানে হলো- মুমিন নামাযের ওয়াক্ত, নামাযের নিয়ম-কানুন মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জিনিসের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখে। অযু ঠিক মতো করে, কখনো যেন বিনা অযুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে, সঠিক ওয়াক্তে নামায পড়ে। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তিসহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দাহ তার প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে নিবেদন করছে। মনে হচ্ছে একান্ত সাক্ষাতে মনের কথাগুলো সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করছে। আর প্রিয় ব্যক্তিটি তার মনের প্রতিটি কথার উত্তর দিচ্ছে।

একজন মুমিনকে এমন নামাযী হতে হবে, যে নামাযের মধ্য দিয়ে জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহর গোলাম বলে মনে হবে, অনুগত গোলামের ন্যায় মালিকের অধীন মনে হবে এবং মালিকের হুকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। মহান আল্লাহর দাস হওয়ার অনুভূতি, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আল্লাহকে আ'লিমুল গায়েব বলে স্বীকার করা, তাঁকে সবসময়ই নিজের কাছে অনুভব করা, তাঁর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখা। আল্লাহর হুকুমগুলো ভাল করে জানার এবং পালন করার মন-মানসিকতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা, আমানতদারী হওয়া, সময়ানুবর্তী হওয়া এসব গুণ মুমিনের মধ্যে সৃষ্টি হবে তখনই যখন সে নামাযের ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হবে।

নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো আযান শোনা মাত্রই পার্থিব জীবনের সকল ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মসজিদের দিকে চলে আসতে হবে।

মুমিন আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে

আমানত শব্দটি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত ও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল আমানত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর ওয়াদা, চুক্তি অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে, মানুষ ও মানুষের মধ্যে এবং জাতি ও জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল চুক্তিকে বুঝায়। এক্ষত্রে গরিব-ধনী, ছোট-বড়, সাদা-কালো, মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে সকলের চুক্তি রক্ষা করার গুরুত্ব একই রূপ। সে দরিদ্র বলে তার সাথে চুক্তি ভঙ্গ করলে সে কিছুই করতে পারবে না। তাই তার সাথে চুক্তি বা ওয়াদা রক্ষা না করলেও চলবে, এরূপ ধারণা করার বিন্দু পরিমাণও সুযোগ নেই।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

لا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهَدَ لَه.ُ

"যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই, আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার বৈশিষ্ট্য নেই তার মধ্যে দ্বীনদারী নেই।" (বায়হাকী)

এই জন্যে বলা হয়, কাউকে যদি চিনতে এবং জানতে হয় তাহলে তার সাথে লেনদেন বা ওয়াদায় আবদ্ধ হও। ওয়াদা রক্ষা করতে পারলে বুঝতে হবে তার মধ্যে দ্বীনদারিত্ব আছে এবং মুমিন কিনা জানতে চাইলে তার কাছে আমানত রাখ, আমানতের সঠিক জবাব দিতে পারলে বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈমান রয়েছে তথা সে মুমিন। কিন্তু বিপরীত আচরণ পেলে তাকেও বিপরীতভাবেই বুঝে নিতে হবে। হাদীসের ভাষ্য মতে সে একজন মুনাফিক বলে বিবেচিত হবে।

রাসূল (স.) ইরশাদ করেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو وَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةَ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ

النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا

خَاصَمَ فَجَر.َ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন: চারটি (দোষ) যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোনো একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. তার কাছে কোনো আমানত

রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে ২. সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, ৪. আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি করে। (বুখারী, মুসলিম)قَال

মুমিন যাকাত আদায়ে সচেতন থাকে

যাকাত, ইসলামের এক শাশ্বত বিধান। নিছক ইবাদত ছাড়াও এতে রয়েছে আত্মিক ও সামাজিক উৎকর্ষ। যাকাত যেমনিভাবে মুসলিমদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিধান করে, তেমনি ধনী-গরিবের বৈষম্যেরও হ্রাস ঘটায়। যাকাত হল আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। কোনো সমাজের দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে যাওয়া ও দেউলিয়া হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচার হাতিয়ার। যাকাত বিধানের যথাযথ প্রয়োগ হলে সমাজে সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায়-দুস্থ মানুষ যেমন থাকবে না, তেমনি মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির হাতে একতরফা সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠারও সুযোগ থাকবে না।

যাকাত ইসলামের অন্যতম ফরয ইবাদত। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি হল যাকাত। কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে নামাযের পাশাপাশি যাকাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ.

তোমরা সালাত আদায় করো এবং যাকাত প্রদান করো। -সূরা বাকারা (০২) : ১১০

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।(সূরা নুর আয়াত:৫৬)

এছাড়া যাকাত প্রকৃত পুণ্যশীলের পরিচয়, মুমিনের বন্ধু, সৎকর্মপরায়ণদের বৈশিষ্ট্য, মসজিদ আবাদকারী, কুরআন মাজীদে যাদের জন্য রয়েছে শুভসংবাদ, যাদেরকে বলা হয়েছে হেদায়েতপ্রাপ্ত, ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভকারী মুমিনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিসহ দ্বীনের মৌলিক পরিচয়ের ক্ষেত্রেও সালাত-যাকাতের বিষয়টি অবধারিতভাবেই আসে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি- এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্ব করা ও রমযানের রোযা রাখা। -সহীহ বুখারী, হাদীস ০৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন, 'যাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ দিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। যাকাতের ফরযিয়তকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।' -ফাতহুল বারী ৩/৩০৯

যাকাত ঈমান প্রকাশের মাধ্যম

একজন ব্যক্তির মুসলমান হওয়া এবং তার ঈমান প্রকাশের একটি উপায় হল যাকাত। কুরআন মাজীদে সালাত আদায় করা ও যাকাত প্রদানকে মুসলিম হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

এরপর যদি তারা (কাফেররা) তওবা করে, নামায আদায় করতে শুরু করে এবং যাকাত দিতে শুরু করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। বাস্তবিকপক্ষেই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল এবং বড় অনুগ্রহকারী। -সূরা তাওবা (০৯) : ০৫

একজন মুমিন কখনো এ সুযোগ হাত ছাড়া করতে পারে না। সে আল্লাহর সাথে এ ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে নিজ সম্পদকে যেমন পবিত্র রাখবে তেমনি আবার নিজেকেও পবিত্র করবে এবং সে নিজেকে ধংসের হাত থেকে রক্ষা করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

"আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর এবং নিজের হাতেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না (আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করলেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা হয়)।" (সূরা আল বাকারা: ১৯৫)

মুমিন আল্লাহর ইবাদতে রাত কাটায়

মুমিন বান্দাদের দিন কাটে রিযিক অন্বেষণ ও আল্লাহর পথে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর রাত কাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও সেজদার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে। মুমিন বান্দাদের রাত আরাম-আয়েশ, নাচ-গানে, খেলা- তামাশায়, গপ-সপে এবং আড্ডাবাজী ও চুরি-চামারীতে অতিবাহিত হয় না। জাহেলিয়াতের এসব পরিচিত বদ কাজগুলোর পরিবর্তে মুমিনরা এ সমাজে এমন সব সৎকর্মসম্পাদনকারী যাদের রাত কাটে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বসে, শুয়ে দোয়া ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে। মুমিনদের এসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْن.

"তাদের (মুমিনদের) পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে এবং যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা আস সাজদাহ: ১৬)

মুমিনরা আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে রাত কাটাবার পরিবর্তে নিজেদের রবের ইবাদত করে। তাদের অবস্থা এমন সব দুনিয়া পূজারীদের মতো নয় যাদের দিনের পরিশ্রমের কষ্ট দূর করার জন্য রাতে নাচ-গান, শরাব পান ও খেলা- তামাশার মতো আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়। এর পরিবর্তে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে, তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি চান অপরাধী বান্দারা ফিরে আসুক। হাদীস শরীফে এসেছে রাসূল (স.) বলেছেন: এক মরুযাত্রী পথ চলছিল। পথ চলতে

গিয়ে এক পর্যায়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পথিক বিশ্রামের প্রয়োজনবোধ করলো। বিশ্রাম নিল, বিশ্রাম থেকে উঠে দেখে তার বেঁধে রাখা উটটি নেই, যে উটটিতে ছিল তার খাদ্য-বস্ত্র পানীয় সবকিছু। রাসূল (স.) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন এমন অবস্থায় ঐ পথিকের অবস্থা কি হবে? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) লোকটির তো আর হতাশার সীমা থাকবে না। কেননা তার বেচে থাকার সকল উপকরণ ঐ উটটির ওপর ছিল। রাসূল (স.) বললেন কিছুক্ষণ হতাশার সাথে চিন্তা করার পর উটটি ফিরে এলো। এমতাবস্থায় লোকটির অবস্থা কি হবে? সাহাবীগণ বললেন, এমতাবস্থায় লোকটির তো দিলটি ভরে যাবে। কারণ লোকটি শুধু উটটি পায়নি বরং বেঁচে থাকার সকল উপকরণও ফিরে পেলো।

রাসূল (স.) বললেন সাহাবীরা শুনো- উট হারানোর পর পুনরায় ফিরে পাওয়ার পর উটহারা ব্যক্তি যেমন খুশি হয়ে যায় তেমনিভাবে আল্লাহর কোন বান্দা যখন পথহারা হয়ে পুনরায় ফিরে আসে, উটহারা ব্যক্তির চাইতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেশী খুশি হয়ে যান।

এ পৃথিবীর সকল মানুষ একে অন্যের সাথে বিভিন্ন ধরনের ভুল বা অপরাধ করে থাকে। যার সাথে অপরাধ করা হয় সে কখনো বলে না যে, এসো অপরাধ করেছ ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দেব। বরং ক্ষমা চাইলেও ক্ষমা করতে চায় না, শুধু প্রতিশোধই নিতে চায়। স্বয়ং পিতা-মাতাও সন্তান ক্ষমা চাওয়া পর্যন্ত ক্ষমা করে না। মন বলে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিব। কিন্তু ডেকে ডেকে বলে না এসো ছেলে অপরাধ করেছ ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দেব। কিন্তু একমাত্র দয়াবান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক গভীর রাতে প্রথম আসমানে আসেন এবং ডেকে ডেকে বলেন তোমরা কে কি অপরাধ করেছ, আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করে দেব। আর এ সুযোগ প্রতিনিয়ত মুমিনগণ কাজে লাগান; হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَاسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيْهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُونِي فَاغْفِرَ لَه.ُ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন: আমাদের মহান বরকতময় রব প্রতিরাতে দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আকাশে) আগমন করেন। তিনি আগমন করেন তখন যখন এক-তৃতীয়াংশ রাত বাকি থাকে তখন তিনি ডেকে বলেন: কে আছে আমার কাছে দোয়া করার, আমি তার দোয়া কবুল করবো? কে আছে আমার কাছে চাওয়ার, আমি তাকে দান করবো? কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আমি তাকে ক্ষমা করবো? (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

মুমিন রাতের প্রথমার্ধে একটু ঘুমিয়ে পুরো দিনের ক্লান্তি দূর করে শেষ রাতে উঠে গিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। রুকু করে, সেজদাহ করে, চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে দয়াবান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

كَانُوا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْن- َ

"রাত্র কালে তারা কমই ঘুমায় এবং অতি প্রত্যুষে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

(সূরা আয যারিয়াত: ১৭-১৮)

মুমিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই মহান আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটাবে এবং অল্প সময় ঘুমাবে এবং রাতের শেষাংশে আপন প্রভুর কাছে এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ তায়ালা তোমার যতটুকু ইবাদত-বন্দেগি করা আমার কর্তব্য ছিল তা করতে আমার ত্রুটি হয়েছে। একজন মুমিন আল্লাহর দাসত্বের এরূপ পরাকাষ্ঠাই দেখাবে যে, সে আল্লাহর বন্দেগিতে জীবনাতিপাত করবে এবং তা সত্ত্বেও এজন্য কোনো রকম গর্বিত হওয়া এবং নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার করার পরিবর্তে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি করার জন্য বিনীতভাবে

প্রার্থনা করবে।

সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান শিক্ষক বিশ্বনবী (স.) রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। হাদীস শরীফে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُوْمُ آخِرَهُ فَيُصَلَّى ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَشِهِ فَإِذَا أَذْنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلا تَوَضَّأَ وَخَرَج.َ

হযরত আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স.) এর রাতের নামায কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন: তিনি [রাসূল (স.)। রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতেন এবং শেষ ভাগে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করতেন এবং তারপর আবার শুয়ে পড়তেন। পরে মুয়াযযিন যখন আযান দিতেন তখন তিনি (বিছানা ছেড়ে) দ্রুত উঠে পড়তেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকলে গোসল করে নিতেন, অন্যথায় শুধু অযু করে (মসজিদের দিকে) চলে যেতেন। (বুখারী)

মুমিন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে

মুমিনের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্যই হলো সে মানুষদেরকে সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বারণ করবে। এ দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন। কুরআনুল কারীম তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ.

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি (উম্মত)। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বারণ (নিষেধ) করবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (সূরা আল ইমরান: ১১০)

সৎকাজের প্রতি আন্তরিক টান, সৎকাজের বিস্তৃতি এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ পক্ষান্তরে অন্যায় কাজের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় কাজে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একজন মুমিন সারাক্ষণ সৎকাজের চিন্তায় বিভোর থাকে। সৎকাজকে সর্বদা নিজের মধ্যে লালন করে থাকে এবং তা বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকে। পক্ষান্তরে মুমিনের হৃদয়ের সকল অশান্তি ও অস্থির উৎসাহ ও পাথেয় হলো অন্যায় কাজ। হরিণ যেমন বাঘের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করে। তেমনিভাবে মুমিন নিজেকে দুনিয়ার সকল অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে অর্থাৎ অসৎ কাজ আর মুমিনের মধ্যে সম্পর্কটি হল অহিনকূল সম্পর্ক। কোন মতেই সে অসৎ কাজকে সহ্য করতে পারে না। শুধু তাই নয় যেই কাউকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখলে মুমিন বিব্রতবোধ করে। অন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক যে ঘৃণা মুমিনের অন্তরে সে ঘৃণাই অন্যায়কে রুখে দাঁড়ানোর প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই কোন দ্বীনি ভাই অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ার পর তা থেকে না ফেরা পর্যন্ত মুমিন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তাকে ন্যায় পথে ফিরিয়ে আনার জন্য।

প্রতিটি মুমিনের উপরই সত্যের প্রচার বা কল্যাণের দিকে আহ্বান এবং অসত্য বা অকল্যাণ থেকে মানুষকে বিরত রাখা কর্তব্য। এটি তার ঈমানের দাবি। এতটুকু কাজ যদি সে না পারে বুঝে নিতে হবে যে, তার মধ্যে ঈমানের লেশমাত্র নেই। যতই সে নিজকে মুমিন বলে দাবি করুক না কেন আসলে সে মুমিন নয়। তাকে অবশ্যই তার অবস্থার আলোকে সত্য মিথ্যার পক্ষ-বিপক্ষ নিতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ - (مسلم(

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.)কে বলতে শুনেছি তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে অবশ্যই তা হাত দিয়ে (ক্ষমতার আলোকে বল প্রয়োগে) স্তব্ধ করে দিবে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে সে মুখের (বুঝানোর মধ্য দিয়ে) দ্বারা তা বন্ধ করে দিবে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে সে অন্তর দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (মুসলিম)

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ যখন মুছে যাবে কোন সমাজ থেকে, তখন সে সমাজে আল্লাহর আযাব ও গযব নেমে আসে। সে আযাব ও গযব থেকে মুক্তির জন্য যতই আল্লাহর কাছে দোয়া করা হোক না কেন কোন লাভ হবে না। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন-

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْلَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. (ترمذى(

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন: আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহ আযাব নাযিল করে শাস্তি দিবেন। অতঃপর তোমরা তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিযী)

দিনাতিপাতে একজন মুমিনের অভ্যাসে পরিণত হবে যে, সে সৎকাজে লোকদের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। সে সহ্যই করতে পারবে না যখন দেখতে পাবে তার পাশে আল্লাহর কোন আদেশ বর্জন হচ্ছে অথবা কোন নিষেধ গ্রহণ হচ্ছে। মুমিন নিজে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যেমন ব্যস্ত থাকবে তেমনিভাবে তার প্রতিবেশী ও পরিবারকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো মান্য করানোর মধ্য দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশও অনুরূপ। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْن.َ

"হে মুমিন লোকসকল! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান- সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে।" (সূরা আত তাহরীম: ৬)

আল্লাহর আযাব থেকে শুধু কেবল নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃতির বিধান যে পরিবারটির নেতৃত্বের বোঝা তার কাঁধে স্থাপন করেছে তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষ রূপে গড়ে উঠতে পারে সাধ্যমত সে শিক্ষা দীক্ষা দেয়াও তার কাজ। তারা যদি জাহান্নামের পথে চলতে থাকে তাহলে যতটা সম্ভব তাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করা। তার সন্তান-সন্ততি পৃথিবীতে সুখী হোক তার শুধু এই চিন্তা হওয়া উচিত নয়। বরং এর চেয়েও তার বড় চিন্তা হওয়া উচিত এই যে, তারা যেন আখেরাতে জাহান্নামের ইন্ধন না হয়। আর মনে রাখতে হবে নিজের অসচেতনতার কারণে যদি নিজ পরিবারের সদস্যরা জাহান্নামের ইন্ধন হয় তাহলে যতই আপনি আমলদারী হোন না কেন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকবে। আপনার প্রতিবেশী বা পরিবারের মধ্যে যারাই আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তাদের ব্যাপারে জবাব দিয়ে তারপরই আপনার আমল বলবে আপনি জাহান্নামে যাবেন না কি জান্নাতে যাবেন। এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন: তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী)

একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য কখনো এমন হওয়া উচিত নয় যে, সে শুধু মসজিদে মসজিদে ঘুরে আল্লাহ-বিল্লাহ করবে, তাসবীহ-তাহলীল করবে আর মসজিদের বাহিরে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য হতে চলবে এবং অন্যায় কাজে সমাজ ছেয়ে যাবে। সে এ বিষয়ে তেমন কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করবে না। নিজে মসজিদে নিরাপদে ঘুমাবে আর বাহিরে মানবতা ধ্বংসিত হতে থাকবে।

শয়তানের রাজত্ব চলবে, দুশ্চরিত্রদের কর্তৃত্ব চলবে, যুলুম শাহীতে ডুবে মরবে দেশ ও জাতি। তা কখনোই হতে পারে না। তা না হয় আল্লাহর রাসূল (স.) কেন তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত

হলেন! উহুদের ময়দানে কেন দন্ত মোবারক হারালেন? অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আগের ও পরের পুরো জীবনকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কোরআন তার সাক্ষী-

اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ ا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَا إِنَّا فَتَحْنا نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.

"(হে নবী) আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার আগের ও পরের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেন। আপনার জন্য তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণত্ব দান করেন এবং আপনাকে সহজ সরল পথ দেখিয়ে দেন।" (সূরা ফাতহ: ১-২)

মুমিন হয় সত্যবাদী

মুমিন জীবন আর সত্যবাদিতা কখনো আলাদা হতে পারে না। মুমিন মানেই তাকে সত্যবাদী হতে হবে। সে যেমন ছয়টি সত্যের ওপর বিশ্বাস রেখে মুমিন হয়েছে তেমনিভাবে জীবনের প্রতিটি প্রতীক্ষণে সত্যের ওপর অবিচল ও অটুট থাকতে হবে। মুমিন শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই দেয় না, সে মনে প্রাণে বিশ্বাস রেখে কাজের মাধ্যমে বাস্তব প্রমাণ দেয়, মূলত মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং কাজের সমন্বয়ে দিনাতিপাতকারীকেই বলা হয় মুমিন। এ সমন্বয়ের ওপরই মুমিনের যাবতীয় কাজ ও চরিত্র নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْن.َ

"প্রকৃত মুমিনতো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয়ও তারা পোষণ করে না, আর আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করে, তারাই সত্যবাদী।" (সূরা আল হুজুরাত: ১৫)

একজন ব্যক্তি যখন সে নিজেকে সত্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইবে তখন তার ওপর প্রথম যে কর্তব্যটি বর্তাবে তা হলো সে নিজেকে সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী করে নিবে। কেননা আল্লাহ তায়ালার স্বাভাবিক বিধান হলো 'যে যেমন চরিত্রের অধিকারী তার সঙ্গী সাথীও তেমনই জুটিয়ে দেন। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ঝোঁক-প্রবণতা এবং আগ্রহ অনুসারেই তার সঙ্গী জুটে। সমাজের এক শ্রেণীর লোক বলে থাকে, লোকটি এতো ভালো লোক হয়ে খারাপ লোকদের সাথে মিশে কি করে? মূলত একথাটি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। প্রকৃতির বিধান হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যেমন চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, রুচি-পছন্দ, স্বভাব-প্রকৃতি ইত্যাদির অধিকারী, তার বন্ধু-বান্ধব, সাথী সঙ্গীও অনুরূপ জুটে যায়।

আল কোরআনের ভাষায়- মুমিন হয় মুমিনের বন্ধু আর কাফির হয় কাফিরের বন্ধু। মুমিনের হৃদয়ের বন্ধন থাকে আরেকজন মুমিনের হৃদয়ের সাথে। সুতরাং মুমিনকে সত্যবাদী হতে হলে তাকে অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে শামিল হতে হবে। আল্লাহর আদেশ হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين.َ

"হে মুমিন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী হও।" (সূরা আত তাওবা: ১১৯)

সত্যবাদী তাদেরকে বলা হয়েছে যারা কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে সততার পরিচয় দেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই যাদের স্বচ্ছতা ও সুন্দরের মোড়কে আবৃত। আল্লাহর নিকট নবীদের পরেই সত্যবাদীদের মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তাদের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন, তারা হলেন- নাবিয়্যিন, সিদ্দিকীন (সত্যবাদী), শুহাদা ও সালেহীন। বস্তুত তারা কতই উত্তম বন্ধু।" (সূরা আন নিসা: ৬৯)

সত্যবাদিতা এমন এক পরশ পাথর যা মুমিনকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন-

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتُبَ عِنْدَ الله صديقا.

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন: "সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। আর কোন লোক যখন নিয়তই সত্য কথা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর কাছে সে সিদ্দিক হিসেবে পরিগণিত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুমিন হবে তওবাকারী

মুমিনদের যে অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে অন্যতম গুণ হবে: যখনই বন্দেগীর পথ থেকে তাদের পা পিছলে যাবে তখনই তওবা করে ফিরে আসতে হবে। নিজের সত্য বিচ্যুতির ওপর অবিচল থাকা যাবে না। মানুষের দিনাতিপাতের মধ্য দিয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, পরিবেশের কারণে বা শয়তানের প্ররোচনায় গুনাহের কাজ ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। অপরাধ হয়ে যেতেই পারে। আর গুনাহ করলে তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত শাস্তির বিধান রয়েছে, কোন অপরাধের জন্য কি শাস্তি হবে, কতটুকু অপরাধের জন্য কতটুকু শাস্তি হবে, ইসলামী শরিয়াতে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। সর্বক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্ধারিত সে শাস্তি থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ও পাথেয় হলো তওবা করে ফিরে আসা।

তওবা শব্দের অর্থ রুজু করা বা ফিরে আসা, বিরত থাকা, বন্ধ করে দেয়া, মুছে ফেলা ইত্যাদি। যারা তওবা করে তাদেরকে তায়েব বলা হয় অর্থাৎ গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী। আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হলো التواب বা রুজুকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তি তওবা করল এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এলো, আল্লাহ তায়ালা তার দিকে অধিকতর রুজুকারী হবেন বা তার দিকে আল্লাহ তায়ালা অতিদ্রুত এগিয়ে আসবেন। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে, অতঃপর এজন্যে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীবও দয়ালু হিসেবে পাবে।" (সূরা আন নিসা: ১১০)

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

হযরত আগার ইবনে ইয়াসার মুয়ান্নী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন: হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা, আমি দৈনিক একশতবার (১০০) তওবা করি।" (মুসলিম)

গুনাহ করার পর যে ব্যক্তি তওবা করে না, অনুশোচনা করে না, অনুতপ্ত হয় না, বরং অবলীলাক্রমে একের পর এক অপরাধ করতেই থাকে। এমনকি একপর্যায়ে এসে এখন আর অপরাধকে অপরাধ বলে মনে হয় না। তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং সে আর মুমিনদের কাতারে থাকে না। এই জন্যে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে কখনো গুনাহ করে বসলে অবশ্যই চোখের পানি ফেলে তওবা করতে হবে এবং গুনাহ মাফ চাইতে হবে। আর যারাই গুনাহ করার পর ক্ষমা চাইবে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশাল জান্নাতের সু- সংবাদ রয়েছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.َ

"দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা আল্লাহভীরুদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।" (সূরা আল ইমরান: ১৩৩)

মুমিন আল্লাহর আযাবের ভয় করে এবং আল্লাহর কাছে আজাব থেকে পানাহ চায়

মুমিন ব্যক্তি যতই ইবাদত করুক না কেন, যতই দান খয়রাত করুক না কেন। কোন ইবাদত বা দান খয়রাতই মুমিনের মধ্যে অহংকারের জন্ম দিতে পারে না।

আমরা আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর পথে জিহাদ করি, যাকাত দেই, হজ করি এবং এসবের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন আমরা নিশ্চিতভাবে পাবো। কাজেই জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। এ ধরনের কোন গর্ব- অহংকার মুমিনের হৃদয়ে জায়গা নিতে পারে না। বরং নামায, রোযা, হজ, যাকাত, দাওয়াতী কাজ, জিহাদ, দান খয়রাতসহ নিজেদের যাবতীয় সৎকাজ ও ইবাদত-বন্দেগির পরেও তাঁরা এ ভয়ে কাঁপতে থাকবে যে, তাদের কাজের ভুল- ত্রুটিগুলো বুঝি তাদের আযাবের কারণ হবে। নিজেদের তাকওয়ার জোরে জান্নাত জয় করে নেবার অহংকার তারা করে না। বরং নিজেদের যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাসহ সকল অপরাধগুলোকে বার বার স্মরণ করে এবং মহান দয়াবান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরম দয়াবান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাঁর পরকালের আযাব হতে পানাহ চায় মুমিন।

মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নেক আমল করা সত্ত্বেও কাফির মুনাফিকদের ন্যায় আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয় না। সে প্রত্যেক পদে পদে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আযাবকে ভয় করতে থাকবে এবং তা থেকে পানাহ চাইতে থাকবে। কোরআন বলছে-

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ

"যারা তাদের প্রভুর আযাবকে ভয় করে।" (সূরা আল মা'আরিজ: ২৭)

অর্থাৎ মুমিনরা নিজস্বভাবে যথাসম্ভব নৈতিকতা ও কাজকর্মে সদাচরণ করা সত্ত্বেও সবসময় আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত থাকে। তারা সবসময় ভাবতে থাকে যে, না জানি আল্লাহর আদালতে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের কাজের তুলনায় অধিক বলে প্রমাণিত হয়ে যায় এবং আমরা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হয়ে যাই, যে আযাব হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘ ও স্থায়ী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا.

"আমরাতো আমাদের রবের পক্ষ থেকে সেদিনের আযাবের ভয়ে ভীত, যা হবে কঠিন বিপদ ভরা অতিশয় দীর্ঘদিন।" (সূরা আদদাহর: ১০)

এ পৃথিবীর অনেক মানুষ অনেক মানুষকে অনেক ধরনের শাস্তি দিয়ে থাকে। আর পৃথিবীর সর্বোচ্চ শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। যার পরে আর কোন শাস্তি দিতে পারে না, দিলেও শাস্তিপ্রাপ্ত তা উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাস্তি হলো অত্যন্ত কঠিন যে শাস্তির আলামত পৃথিবী উপলব্ধিও করতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

إِنْ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد.ٌ

"নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও (আযাব) বড়ই শক্ত।" (সূরা আল বুরূজ: ১২)

সেই শক্তিশালী আযাবে গুনাহগার যখন পতিত হবে তখন সে ঐ শক্তিশালী আযাবে বাঁচবেও না আবার মরবেও না অর্থাৎ পরকালীন পুরো জীবনে সেই শক্তিশালী আযাবের কাঠিন্যতায় পড়ে থাকতে হবে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন-

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى - ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى-

"যে বৃহৎ আগুনে প্রবেশ করবে, তারপর সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।" (সূরা আ'লা: ১২-১৩)

মুমিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক এবং তাঁর আযাবকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি সৃষ্টিকুলে কারো নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে সতর্কসুলভ ভাষা দিয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন-

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِين.َ

"এখন তারা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রবের অনুগ্রহ সর্বব্যাপী এবং অপরাধীদের ওপর থেকে তাঁর আযাব রদ করা যেতে পারে না।" (সূরা আল আনআম: ১৪৭)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِين.َ

"সে (নূহ এর ছেলে) বললো, আমি এখনই একটি পাহাড়ে চড়ে বসছি। তা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে। নূহ বললো আজ আল্লাহর হুকুম (আযাব) থেকে বাঁচাবার কেউ নেই, তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করবেন সে ছাড়া। এমন সময়
একটি তরঙ্গ উভয়ের মধ্যে আড়াল হয়ে গেলো এবং সেও নিমজ্জিতদের দলে শামিল হয়ে গেলো।" (সূরা হুদ: ৪৩)

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইহকাল ও পরকালে গুনাহগারদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আযাব হতে পারে। দুনিয়াতে কখনো জলোচ্ছ্বাস, কখনো ভূমিকম্প, কখনো ঘূর্ণিঝড়, কখনো ডায়রিয়া কখনো কলেরা, কখনো মহামারি আবার কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ইত্যাদি। আল্লাহর আযাবের ধরনের কোন শেষ নেই। কর্ম অনুযায়ী যখন যেখানে যে আযাব দেয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন, তখন সেখানে সে আযাবই আল্লাহ তায়ালা দিয়ে থাকেন। সে আযাবগুলো বড় হোক অথবা ছোট হোক মুমিন তা থেকে সর্বদা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। আর পরকালের আযাবেরতো কথাই নেই, দুনিয়াতে আমরা যে আযাব অবলোকন করি আল্লাহর ভাষায় তা হলো পরকালের নমুনামাত্র। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْن.َ

"আযাব এরূপই হয়ে থাকে, আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বড় হায় তারা যদি জানতো।" (সূরা আল কলম: ৩৩)

সুতরাং মুমিন ইহকালীন-পরকালীন, বড়-ছোট সকল ধরনের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। সে অপরাধীদের ন্যায় বুক ফুলিয়ে অহংকারে মেতে উঠবে না।

মুমিন অপচয় করে না- কৃপণও হয় না

মুমিন এমন হবে না যে, আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসন, মদ-জুয়া, মেলা-পার্বন এবং বিয়েশাদীর পিছনে অঢেল টাকা-পয়সা খরচ করবে এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে অনেক বেশী নিজকে দেখাবার জন্য খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ী-গাড়ী, সাজ-গোছ ইত্যাদির পিছনে অঢেল টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিবে। মুমিন আবার এমনও হবে না যে, অর্থলোভীর মতো একটা পয়সা গুনে গুনে রেখে কৃপণতার চরম শিহরে আরোহণ করবে। নিজে খাবে না, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন মেটাবেনা, এ ধরনের লোক আরবে আল্লাহর রাসূলের সময় বিপুল সংখ্যক পাওয়া যেতো। এ প্রসঙ্গে অমিতব্যয়িতা ও কার্পণ্য কি জিনিস তা স্পষ্ট হওয়া উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিসকে অমিতব্যয়িতা বলা হয়

এক. অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করা, তা একটি পয়সা হলেও।

দুই. বৈধ কাজে ব্যয় করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে সে নিজের সামর্থ্যের চাইতে বেশী ব্যয় করে অথবা নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী যে অর্থ সম্পদ সে লাভ করেছে তা নিজেরই বিলাস-ব্যসনে ও বাহ্যিক আড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে পারে।

তিন. সৎকাজে ব্যয় করা, কিন্তু আল্লাহর জন্য নয় বরং অন্য মানুষকে দেখাবার জন্য।

পক্ষান্তরে কার্পণ্য বলে বিবেচিত হয় দু'টি জিনিস। যেমন-

এক. মানুষ নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সামর্থ্য ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয় করে না। দুই. ভালো ও সৎকাজে তার পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। এ দু'টি প্রান্তিকতার মাঝে ইসলামই হচ্ছে ভারসাম্যের পথ।

গর্ব, অহংকার ও ভোগবিলাসে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। আর এ-অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই শয়তানের ভাই। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল ইরশাদ করেন-

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا.

"আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও। অপব্যয় করো না। যারা ধন-সম্পদ অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা

বনী ইসরাঈল: ২৬-২৭)

সম্পদ ব্যয়ে যদি মানুষ ভারসাম্য রক্ষা না করে তাহলে মানুষ হয় অপমানিত হয়ে যায় অথবা নিঃস্ব হয়ে যায়। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, বাজে ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনে ও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন-সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে। আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

"নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না (কৃপণতা করোনা) এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিওনা (অপচয় করোনা), তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৯)

কৃপণতা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা মানুষের মধ্যে প্রবেশ করলে ইহকালীন জীবনে হতে হয় অপমানিত এবং পরকালীন জীবনে পতিত হতে হয় এক কঠিনতম ও যন্ত্রণাদায়ক স্থানে। কালামে হাকীমে বর্ণিত হয়েছে-

الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ - يَحْسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ - كَلَّا لَيُنبَذَنْ فِي الْحُطَمَةِ.

.

"যে অর্থ: সম্পদ জমা করে এবং তা গুনে গুনে হিসাব রাখে, মনে করে তার এ অর্থ-সম্পদ চিরদিন তারই থাকবে। কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গায় ফেলে দেয়া হবে।" (সূরা আল হুমাযাহ: ২-৪)

এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর হাদীস হলো-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنِي قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيل.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স.) বলেছেন, দাতা ব্যক্তি আল্লাহর যেমন নিকটবর্তী, তেমনি নিকটবর্তী মানুষেরও। আবার বেহেশতের যেমন নিকটবর্তী, তেমনি জাহান্নাম থেকে বেশ দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে যেমন দূরে, তেমনি দূরে মানুষের কাছ থেকে ও বেহেশত থেকে, অপরদিকে সে জাহান্নামের খুব নিকটবর্তী। আর একজন অশিক্ষিত দাতা ব্যক্তি একজন কৃপণ আবেদের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়।" (তিরমিযী)

রাসূলে আকরাম (স.) আরো ইরশাদ করেছেন-

عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِدِّيقِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حِبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّان.

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (স.) বলেছেন, "প্রতারক কৃপণ ও খোটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (তিরমিযী)

সুতরাং একজন মুমিন যখন ব্যয় করে তখন তার মধ্যে সর্বোচ্চ ভারসাম্য পরিলক্ষিত হবে, না সে অযথা ব্যয় করবে আবার না সে শুধু গুনে গুনে জমা করবে। প্রয়োজনের আলোকে খরচ করবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا.

"তারা (মুমিনরা) যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না এবং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।" (সূরা আল ফুরকান: ৬৭)

মুমিনের আচরণ মূখর্তার জবাবে হয় শান্তিপূর্ণ

মূর্খ বলতে অশিক্ষিত বা লেখা পড়া জানেনা, অক্ষর জ্ঞান নেই এমন লোককে বুঝানো হয়নি। বরং মূর্খ বলতে এমন লোককেই বুঝানো হয়ে থাকে যাদের মধ্যে দ্বীনদারিতার কোনো জ্ঞান নেই, যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যারা জাহেলি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন সভ্য-ভদ্র ও দ্বীনদারি লোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করে। মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হবে তারা এসব মূর্খ লোকদের গালি বা অশালীন ব্যবহারের জবাবে গালি বা অশালীন ব্যবহার এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করবে না। বেহুদাপনার জবাবে বেহুদাপনা করবে না। বরং যারাই তাঁদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে মুমিন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিষয়টি সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করে দিয়েছেন-

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.

"আর যখন তারা কোনো বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায় এবং বলে, আরে ভাই আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো আর তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।" (সূরা আল কাসাস: ৫৫)

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) এর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন এরপর যখন নবী (স.) এর নবুয়াত প্রাপ্তি এবং তাঁর দাওয়াতের খবর সেই দেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সেখান থেকে প্রায় ২০ জনের একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য মক্কা মুয়াযযামায় এলো। তারা নবী (স.) এর সাথে মসজিদে হারামে সাক্ষাৎ করলো, কুরাইশদের বহু লোক এ ব্যাপার দেখে আশপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রতিনিধি দলের লোকেরা নবী (স.) কে কিছু প্রশ্ন করলো। তিনি সেগুলোর জবাব দিলেন, তার পর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কোরআনের কিছু অংশ তাদের সামনে পাঠ করে শুনালেন, কুরআন শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। তারা একে আল্লাহর বাণী বলে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলো এবং নবীজির প্রতি ঈমান আনলো। মজলিস শেষে আবু জেহেল ও তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথী প্রতিনিধি দলের লোকদেরকে পথে ধরলো এবং তাঁদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলে তিরস্কার করলো।

এরপর তারা প্রতিনিধি দলকে বললো তোমাদের সময়টাতো বৃথা হলো। তোমাদের স্বধর্মীয়রা তোমাদেরকে এজন্য পাঠিয়ে ছিলো যে, এ ব্যক্তির (নবীজির স.) অবস্থা সম্পর্কে তোমরা যথাযথ

অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত ও যথার্থ ঘটনা তাদেরকে জানাবে। কিন্তু তোমরা সবেমাত্র তাঁর কাছে বসেছিলে আর এরি মধ্যেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে তাঁর প্রতি ঈমান আনলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কখনো আমরা দেখিনি।"

একথায় তাঁরা (মুমিনরা) জবাব দিলো ভাইয়েরা তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে জাহেলি বিতর্ক করতে চাই না। আমাদের পথে আমাদের চলতে দাও এবং তোমাদের পথে তোমরা চলতে থাকো। আমরা জেনে বুঝে কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে চাই না।" (সীরাতে ইবনে হিশাম)

একজন মুমিন সর্বদা ভালো আচরণ দিয়েই মন্দ আচরণের মোকাবেলা করে থাকে। কেননা, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ভদ্রতা ও মানবতাবোধ থাকে সে মন্দের মোকাবেলায় ভালো আচরণ দেখতে পেলে খারাপ আচরণে আর স্থির থাকতে পারে না। বরং তার অন্তরে ঘৃণা ও হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। ভালো দিয়েই মন্দের মোকাবেলা করো, তখন দেখবে, যে তোমার শত্রু সেও প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। এ গুণ তাদেরই নসীব হয় যারা ধৈর্যশীল। আর এ গুণের অধিকারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।" (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ: ৩৪-৩৫)

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণী হলো-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ مَا تُعْطَيْنَا الْجَزَلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضَبَ عُمَرُ حَتَّى هُمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিসন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে খাত্তাবের পুত্র। আল্লাহর শপথ, আপনি আমাদের বেশী দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করেন না। এ কথায় ওমর (রা.) ক্রোধান্বিত হলেন, এমনকি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন, তখন (হিসন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র) হুর ইবনে কায়েস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন!

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (স.) কে বলেছেন,

“ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করো, ভালো কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো," (সূরা আল আরাফ: ১৯৯)

রাবী (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন আল্লাহর শপথ! এ আয়াত শুনে ওমর (রা.) আর অগ্রসর হননি। তিনি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ শোনা মাত্রই সর্বাধিক অনুগত হয়ে যেতেন। (বুখারী)

আল্লাহর আয়াতের সম্মুখে মুমিনের ঈমান বেড়ে যায়

মুমিনের সামনে যখন আল্লাহর কোনো আয়াত বা হুকুম আসে এবং সে তা মেনে নিয়ে আনুগত্যের শির নত করে দেয় তখনই তার ঈমান বেড়ে যায়। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

"আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের (মুমিনদের) সামনে পড়া হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।" (সূরা আল আনফাল: ২)

যখনই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর প্রিয় রাসূলের হেদায়াতের মধ্যে মুমিন এমন কোনো জিনিস দেখে, যা তার ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, মতবাদ, আচার-আচরণ, স্বার্থ, আরাম-আয়েশ, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব বিরোধী হয় এবং সে তা মেনে নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেকে বা নিজের ইচ্ছাকে পরিবর্তিত করে ফেলে এবং তা গ্রহণ করতে গিয়ে কষ্ট স্বীকার করে নেয়, তখন মুমিনের ঈমান আরও তরতাজা ও পরিপুষ্ট হয়। আর তখন সৃষ্টি হয়ে যায় আত্ম-সম্মান ও মর্যাদা এবং এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত না করার প্রবণতা।

ব্যক্তি যখন পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে যায় তখন সে আয়াতের সম্মুখীন হলে ঈমান তার আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফলে সে আরও সম্মানজনক শক্তির অধিকারী হয়ে যায় এবং তার মধ্যে আত্ম-সম্মান পয়দা হয়ে যায়। আর তখন সে শুধুমাত্র এক আল্লাহর সামনেই মাথা নত করতে শিখে।

মুমিন ভীত হয়ে যায় আল্লাহর স্মরণে

খোদাভীতি এমন একটি গুণের নাম, মুমিন হওয়ার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। দুনিয়ার কল্যাণ, পরকালীন মুক্তি এবং সাফল্য এর মধ্যেই নিহিত। ব্যক্তি জীবনের সুখ, পারিবারিক জীবনের শান্তি, সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভারসাম্য সব কিছু যেন খোদা ভীতির বেষ্টনীর আওতায় বিদ্যমান। নবী করীম (স.) বলেছেন, 'তাকওয়াকে' গ্রহণ কর, তা সমস্ত কল্যাণের উৎস।"

ইসলামে সাদা-কালো, আরবি-আজমি, ধনী-গরিব এর মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা মূল্যায়ন হয় না বরং তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদাবান হয়। এ ক্ষেত্রে কোরআনুল কারীমের বক্তব্য হলো-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير.ٌ

"হে মানবমণ্ডলী: আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও নারী (আদম ও হাওয়া)থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক জ্ঞাত এবং সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল হুজুরাত: ১৩)

মুমিনকে প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার কোন কথা, কোন কাজ, কোন আচরণ এবং কোন পদক্ষেপ যেন আল্লাহ তায়ালার পছন্দের বিপরীত না হয়। প্রতিটি কাজে মুমিন মহান আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং এটাই হলো, ঈমানের দাবি। মুসলিম জাহানের খলিফা হযরত ওমর (রা.) এক গভীর রাতে মদিনার একটি পথ অতিক্রম করছিলেন জনগণের অবস্থা জানার জন্য। এটি তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল। পথ চলার মাঝে একটি ঘর থেকে কথাবার্তার কিছু মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন। থমকে দাঁড়ালেন বিশ্ব মুসলিম জাহানের খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) জানতে চাইলেন কেউ কোনো বিপদে পড়েছে কিনা? কান পেতে শুনতে পেলেন এক মহিলা তার মেয়েকে ডেকে বলছে, মা দুধে পানি মিশাও সকাল বেলায় বিক্রি করতে হবে। তাহলে একটু বেশী লাভ করা যাবে। মেয়েটি বললো: মা! আমি দুধে পানি মিশাতে পারব না। কারণ হলো খলিফা ওমর (রা.) আদেশ দিয়েছেন দুধে পানি মিশানো যাবে না।

মা বললো মেয়েটি আমার গিয়ে দেখ, খলিফা ওমর (রা.) জনমের মতো ঘুমাচ্ছেন, সেতো দেখবেও না, শুনবেও না, তাড়াতাড়ি পানি মিশাও।

মেয়েটি বললো: খলিফা ওমর (রা.) দেখছেন না, তাঁর চোখকে ফাঁকি দেয়া যেতে পারে ঠিক আছে কিন্তু তোমার আমার স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চোখ তো ফাঁকি দেয়া যাবে না। তিনি সবকিছু শোনেন এবং দেখেন। সুতরাং আমি একাজ করতে পারব না।

খলিফা ওমর (রা.) স্বয়ং নিজ কানে মা ও মেয়ের কথোপকথন শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন কি দিয়ে মেয়েটিকে দুনিয়ার জীবনে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। অবশেষে অর্ধ পৃথিবীর শাসক হযরত ওমর (রা.) নিজ পুত্রের সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। আর সে মেয়ের ঘরে যে মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন ইসলামের পঞ্চম খলিফা হযরত ওমর ইবনুল আবদুল আজিজ (রহ.) সেই মেয়ের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।
উপরোল্লিখিত ঘটনাটি হলো প্রকৃত খোদাভীতি, আপনার পিছনে কোন পুলিশ থাকবে না, আইন শৃঙ্খলার কোন সদস্যই আপনার পিছনে থাকবে না। কোনো গোয়েন্দা নজর থাকবে না। এরপরও আপনি এক আল্লাহকে স্মরণে রেখে সকল ধরনের অপকর্ম থেকে বিরত থাকবেন। কেননা আল্লাহর নজরদারিতাকে যদি আপনি ভয় না করেন, আপনি যদি আল্লাহর উপস্থিতিকে উপলব্ধি না করেন, তাহলে কখনই আপনি অপরাধ থেকে বাঁচতে পারবেন না। পৃথিবীর যে কাউকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব কারণ সেও তো আপনার মতো একজন মানুষ। তাই একজন মুমিন সার্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণে রেখে তাঁর আযাবকে ভয় করে দিনাতিপাত করে থাকে।

মুমিন হবে ধৈর্যশীল

আল কোরআনে নৈতিক চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য যেসব বিষয়ের ওপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ধৈর্যই হচ্ছে মূল ভিত্তি। ধৈর্য যখন মুমিনের মধ্যে পূর্ণভাবে এসে যায় তখন সে সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেই কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হলে সাহস ও হিম্মতহারা না হয়ে পর্বতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যর্থতা তার হৃদয়ে কোন জায়গা নিতে পারে না। যখন আপাত দৃষ্টিতে সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায়না তখনো মুমিনরা সত্যের পথে টিকে থাকে।

মুমিন ব্যক্তি ধৈর্যের সাথে সত্যের পথে টিকে থাকে যখন, আল্লাহর রহমত তার জন্য অবধারিত হয়ে যায় তখন। ফেরাউনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বনী ইসরাঈলকে হযরত মূসা (আ.) নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন তোমাদের অবস্থা যতই নাজুক ও সংগিন হোক না কেন, সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে, তাহলে আল্লাহর রহমত, কুদরত ও হিকমত দেখতে পাবে। পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর, যাকে খুশি তিনি কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ তায়ালার কালামুল হাকীমে প্রায় হুবহু এ বিষয়টি এসেছে-

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

"মূসা তাঁর জাতিকে বললো আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো (সত্যের ওপর অবিচল থাক)। পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর যারা তাঁকে ভয় করে কাজ করে চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্য নির্ধারিত।" (সূরা আল আরাফ: ১২৮)

ধৈর্যের তিনটি পর্যায় রয়েছে। যেমন-

এক. আবেগ উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

দুই. কঠিন মুহূর্তেও সত্যের ওপর অবিচল থাকা এবং নিজের নীতি আদর্শকে বিসর্জন না দেয়া।

তিন. সত্যের পথে চলতে গিয়ে যাবতীয় যুলুম নির্যাতনকে হাসিমুখে বরদাশত করা।

ভয়াবহ ও কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অভিযোগ না করে চোখের পানি না ফেলে, কাকুতি-মিনতি না জানিয়ে, অস্থিরতা প্রকাশ না করে অটল ও অবিচল থেকে যে ধৈর্যের প্রকাশ ঘটানো হয় তাকেই সর্বোত্তম ধৈর্য বলা হয়। কোরআনের ভাষায় যাকে صبر جميل বলা হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَجَاءُوْا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون.َ

"তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাবা বললো, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করবো এবং খুব ভালো করেই সবর করবো। তোমরা যে কথা সাজাচ্ছো তার ওপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।" (সূরা ইউসুফ: ১৮)
আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হলো একটু বদদোয়াও করলেন না।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন: তিনটি সময় ধৈর্য অবলম্বন করার সর্বোত্তম সময়

এক. বিপদ মুসিবতে নিপতিত হলে ধৈর্যধারণ করা।

দুই. মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার সময় ধৈর্যধারণ করা।

তিন. আল্লাহর নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

বিপদ মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার দৃষ্টান্ত তো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (নবী- রাসূলদের ধৈর্য)। মহান আল্লাহর আদেশ-পালন করার সময় ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে, যেমন- নামাযের ক্ষেত্রে। নামাযে যখন কোন মানুষ দণ্ডায়মান হয়, তখনতো সে মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়, এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা যেমনি ধৈর্যহীনতার পরিচয় তেমনি বেয়াদবীর শামিল। অনুরূপভাবে আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হলে অবশ্যই ধৈর্যের প্রয়োজন। যেই কোন প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আল্লাহর নাফরমানি থেকে ধৈর্যের সাথে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। বৃদ্ধ মাতা-পিতা অসুস্থ, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করা যাচ্ছে না, স্ত্রীর পরনে কাপড় নেই, সন্তান-সন্ততিকে ভালো পোশাক পরানো যাচ্ছে না এবং ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়ানো যাচ্ছে না, নিজের মাথা গোজার মতো একটি বাড়ি নেই, ভাড়া বাড়িতে বাস করতে হয় বাড়ির মালিক কটু কথা শোনায়,

এর বিপরীতে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অবৈধ পথে অর্থোপার্জনের অনেক পথ খোলা রয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এসব অবৈধ পথ অবলম্বন করলেই অভাব মোচন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যে-কোন অবৈধ পথ থেকে নিজেকে পরম ধৈর্যের সাথে বিরত রেখে সততার পথে অটল অবিচল থাকাই হলো, আল্লাহর নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

নাবিয়্যিন, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীন এই চার শ্রেণীর লোকগণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন। আর এটি সম্ভব হয়েছে ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করার কারণেই। কেননা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারলে সফলতা অর্জন করা যায় এবং ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে অসীম বরকত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنْ فِيْكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِين.ِ

"অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশত লোক ধৈর্যধারণকারী হয়, তবে তারা দুইশতের ওপর, আর হাজার লোক এমন হলে দুই হাজার লোকের ওপর আল্লাহর আদেশে বিজয়ী হবে। কিন্তু আল্লাহ কেবল সেই লোকদের সঙ্গী হন, যারা ধৈর্যধারণকারী।" (সূরা আল আনফাল ৬৬)

সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় যে ধৈর্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে পৃথিবীর সকল সফলতা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে এবং মহান আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি ও তাঁর অনুগ্রহ লাভে সে ধন্য হয়। আর যার প্রতি আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি ও অনুগ্রহ নিপতিত হয়, সারা পৃথিবী তার জন্য হয়ে যায়। কবি বলেন-

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দৃষ্টি যদি তার কোন গোলামের প্রতি নিপতিত হয় তার সে গোলাম বাদশায় পরিণত হয়ে যায়, তাঁর রহমতের দৃষ্টি যদি এক ফোঁটা পানির প্রতি নিপতিত হয় সে পানি ফোঁটা অগাধ জলধীতে পরিণত হয়ে যায়।"

ধৈর্য্য ধারণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

অর্থ: "অতএব, আপনি উত্তম ধৈর্য্য ধারণ করুন"। [সূরা মা'য়ারিজ ৭০:৫]

সূরা ইউনুসের ১০৯নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

অর্থ: "আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং ধৈর্য্য ধারণ কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী"। [সূরা ইউনুস ১০:১০৯]

ধৈর্য্য মানুষকে চারিত্রিক মজবুতি দানের পাশাপাশি মানুষের কৃত গুনাহ মাফ করে তাকে পরিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هُمْ وَلَا حَزَن وَلَا أَذًى وَلَا غم، حَتَّى

الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إلا كفر الله بِهَا مِنْ خَطَايَاه

অর্থাৎ, "কোন মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে কোন শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্য্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ প্রতিদান স্বরূপ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এমনকি যদি সামান্য একটি কাটাও পায়ে বিঁধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়"। [বুখারী মুসলিম]

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ

অর্থ: "যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য্য ধারণের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি"। [বুখারী মুসলিম]

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

অর্থ: "হে মুহাম্মদ ধৈর্য্যের সাথে কাজ করতে থাক, তোমার এই ধৈর্য্যের তাওফিক তো আল্লাহই দিয়েছেন, ওদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত চিন্তিত হইয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের দরুন মন ভারাক্রান্ত করো না"। [সূরা নাহল ১৬:১২৭]

সূরা আনআমের ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَجَبًا لأمر المؤمنِ إِنَّ أَمْرَه كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وليس ذلك لأحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابتهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فكانتْ خَيْرًا لَهُ وإِنْ أَصَابتهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فكانتْ خَيْرًا لَهُ

অর্থাৎ, “মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর, তার প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, আর এই সৌভাগ্য মুমিন ছাড়া কেউই লাভ করতে পারে না। দুঃখ- কষ্টে নিমজ্জিত হলে সে ধৈর্য্য ধারণ করে আর এটা হয় তার জন্য কল্যাণকর। সুখ শান্তি লাভ করলে সে শোকর আদায় করে আর এটাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে"। [মুসলিম]

সুতরাং মুমিন হতাশ হবে না, নিরাশ হবে না, নিথর হবে না এবং ভেঙ্গে পড়বে না। শত প্রতিকূলতার মাঝে সে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে নিজেকে ধন্য করবে। মুমিন দেখতে পাবে তার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ জমা হয়েছে, ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অমাবস্যার এমন কালো ছায়া তাকে আবৃত করছে যার সুবেহ সাদেকের সম্ভাবনার লক্ষণ নেই। তবুও সে হতাশ হবে না, ধৈর্য হারাবে না। মুমিন বিশ্বাস করবে অন্ধকার যতই ঘনীভূত হোক সকালের লাল সূর্য উদিত হবেই হবে। না হয় এই অন্ধকারেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তবুও সে কাপুরুষের ন্যায় অন্যায়ের সামনে মাথা নত করবে না।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা মুমিনের গুণ

মানুষের ষড়রিপুর অন্যতম একটি হলো রাগ। রাগ এমন একটি অস্বস্তিকর তীব্র মানসিক অবস্থা, যা মানুষের শুভ বুদ্ধিকে কমিয়ে দেয়। রাগের কারণে একজন ব্যক্তি মানসিক অস্বস্তির পাশাপাশি শারীরিক অস্বস্তিতেও ভোগেন।

কেউ কেউ রাগকে একটি আবেগ হিসেবে দেখে থাকেন, যা অস্বস্তিকর উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে ব্যক্তির মানসিক

ও শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি ধর্মীয়ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা অনেক সময় রাগের কারণে স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ হওয়ায় অনেকে গর্হিত ও অহিতকর কাজ করে ফেলে, যা শরিয়তে ব্যাপকভাবে নিষেধ। এজন্য শরিয়তে রাগকে সমূলে দমন করার নির্দেশনা রয়েছে। যাতে মানুষ গর্হিত ও অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

পবিত্র কোরআনে রাগ দমনকে মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বলা হয়েছে। এ মর্মে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, ‘যারা রাগ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল (তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত)। আর আল্লাহতায়ালা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪)

আয়াতে রাগ সংবরণ এবং মানুষকে ক্ষমা করার বিষয়টি পাশাপাশি বলা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় দিক হলো, মানুষ সাধারণত অন্য মানুষের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কিংবা অন্য মানুষ দ্বারা তার ছোট ছোট অধিকার হরণের শিকার হয়ে রাগ করে থাকে। প্রথমে বিষয়টি ছোট আকারে শুরু হলেও রাগ দমন করতে না পারলে তা বৃহৎ আকার ধারণ করে। কিন্তু শুরুতেই যদি ছোট ছোট ভুল করা লোকদের ক্ষমা করে দেওয়া যায় কিংবা বিষয়টির মীমাংসা করে ফেলা হয়, তাহলে তা বৃহৎ আকার ধারণ করে অরাজকতা সৃষ্টি হবে না। এজন্যই আয়াতে রাগ সংবরণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাই কোনো মানুষের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাগ করলে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের জন্য রাগ দমন করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

রাগ সংবরণ করা এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া মুমিন মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,
‘তারা যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়।’ (সুরা শুরা, আয়াত ৩৭)

মুমিন ব্যক্তিরা রাগের সময় নিজেদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে না। বরং রাগের সময়ও তাদের মাঝে ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রাবল্যতা থাকে। তারা রাগ সংবরণ করে মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। তারা জানেন মহান আল্লাহ এর প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দেবেন।

হাদিসে এসেছে, ‘এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসুল (সা.) বললেন, তুমি রাগ প্রকাশ করবে না, এতে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে।’ (তাবরানি)

মানুষের প্রতি মানুষের রাগ-ক্রোধ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নানা কলহ সৃষ্টি করে। তাই আসুন রাগ দমন করে ক্ষমাশীলতার চর্চা জোরদার করি। এতে মিলবে মহান আল্লাহর ভালোবাসা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা।

ক্ষমা মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। এটি প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ ক্ষমাশীলদের ভালোবাসেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর যারা মানুষকে ক্ষমা করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৪)
আল্লাহর রাসুল (সা.) ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তাঁর ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ হলে তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন না। বরং ক্ষমা ও ভালোবাসার মাধ্যমে তাকে কাছে টেনে নিতেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি নবীজির সঙ্গে হাঁটছিলাম।

তাঁর পরনে ছিল মোটা কাপড়ের একটি নাজরানি (ইয়েমেনি) চাদর। এক বেদুইন তাঁর কাছে এসে সেই চাদর ধরে সজোরে টান দিল। আমি দেখলাম মোটা কাপড়ের ঘষায় নবীজির কাঁধে দাগ বসে গেল। লোকটি কর্কশ স্বরে তাঁকে বলল, 'আল্লাহর যে সম্পদ তোমার কাছে আছে তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলো!' নবীজি (সা.) লোকটির দিকে ফিরে তাকান এবং মুচকি হাসেন।
এরপর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দেন। (বুখারি, হাদিস : ৩১৪৯)
পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ক্ষমাশীল মনোভাব অবলম্বনের তাগিদ দিয়েছেন। মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করার আদেশ দিয়েছেন। মূর্খদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন এবং মানুষকে ভালো বিষয়ের আদেশ করুন।
আর মূর্খদের উপেক্ষা করুন।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৯৯)

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) মহান আল্লাহর এই বাণী 'আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন' সম্পর্কে বলেন, রাসুল (সা.)-কে মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা ক্ষমা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৮৭)

এই আয়াত শুনে ওমর (রা.)-ও কঠিন রাগ নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমাশীলতার পথই অবলম্বন করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উয়াইনাহ ইবনে হিসন ইবনে হুজাইফাহ এসে তাঁর ভাতিজা হুর ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান করলেন। ওমর (রা.) যাদের পার্শ্বে রাখতেন হুর নামক ব্যক্তি ছিলেন তাদের একজন। কারি, যুবক-বৃদ্ধ সবাই ওমর ফারুক (রা.)-এর

মজলিসের সদস্য এবং উপদেষ্টা ছিলেন। এরপর উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে ডেকে বলেন, এই আমিরের কাছে তো তোমার একটা মর্যাদা আছে, সুতরাং তুমি আমার জন্য তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি নাও। তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছে আপনার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর হুর উয়াইনাহর জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে ওমর (রা.) অনুমতি দিলেন। উয়াইনাহ ওমরের কাছে গিয়ে বলেন, হ্যাঁ, আপনি তো আমাদের অধিক অধিক দানও করেন না এবং আমাদের মধ্যে সুবিচারও করেন না। ওমর (রা.) রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে কিছু একটা করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহ তাআলা তো তাঁর নবী (সা.)-কে বলেছেন, ‘ক্ষমা অবলম্বন করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের উপেক্ষা করো।’ আর এই ব্যক্তি তো অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম! ওমর (রা.) আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। ওমর আল্লাহর কিতাবের বিধানের সামনে চুপ হয়ে যেতেন। (বুখারি, হাদিস : ৪৬৪২)

এভাবেই পবিত্র কোরআনের আদেশ পালন ও রাসুল (সা.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন। প্রিয় নবীর ক্ষমাশীলতা, উদারতায় মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। প্রিয় নবীর মাঝে যদি এই মহৎ গুণ না থাকত, তাহলে এর চিত্র ভিন্ন রকমও হতে পারত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি বিনম্র থেকেছেন। আপনি যদি কর্কশ ও কঠোর মনের হতেন, তাহলে এরা সবাই আপনার চারপাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত। সুতরাং তাদের ক্ষমা করুন, তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করুন।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯)

অতএব আমাদের উচিত, ক্ষমাশীল হওয়া। ঘৃণা নয়, ভালোবাসা দিয়েই সব কিছু জয় করা। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুমিন আল্লাহর যমীনে নম্রভাবে চলে

একজন সত্যিকার মুমিন কখনো অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মত চলে না। বরং মুমিনের চালচলন হবে একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎ স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। তবে নম্রভাবে চলার মানে দুর্বল ও রোগীর মতো চলা নয় এবং নিজের আল্লাহভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের কৃত্রিম চলার ভংগী সৃষ্টি করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। হযরত ওমর (রা.) এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ? সে বললো 'না' হযরত ওমর (রা.) ছড়ি উঠিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো! বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মুমিন বান্দাগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে সে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ নম্রতা ও ভদ্রতা বজায় রেখে চলা ফেরা করবে। আল্লাহ বলেন-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا.

"রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলে।" (সূরা আল ফুরকান: ৬৩)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِفَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً.

"যমীনে দম্ভভাবে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৭)

কোরআন আরো বলছে-

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ.

"নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো।"

(সূরা লোকমান: ১৯)

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মানুষের চলার মধ্যে এমনকি গুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে চলার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভঙ্গির নাম নয় বরং আসলে এটি হয় তার মন-মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদাবান সম্পন্ন ব্যক্তির চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র দ্বীন হীনের চলা, একজন খোদাভীরু ব্যক্তির চলা আর একজন গুণ্ডা ও বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও যালেমের চলা, একজন অহংকারীর চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরপর থেকে এত বেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেকেই দেখে কোন ধরনের চলার পেছনে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

"রাসূল (স.) এর চলা ফেরায় গাম্ভীর্য, আত্মসম্মানবোধ, ভদ্রতা ও দায়িত্ববোধ প্রতিফলিত হতো। দৃঢ়ভাবে পা ফেলে চলতেন। অলসভাবে পা ঘসে ঘসে চলতেন না। চলার সময় দেহ থাকতো গুটানো। প্রয়োজন নাহলে ডানে বামে না তাকিয়ে পথ চলতেন। সামনের দিকে সতেজ পা তুলতেন। চলার সময় শরীর কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতো। মনে হতো যেন ওপর হতে নিচে নামছেন। হিন্দ বিন আবি হানার ভাষায়, তাঁর চলা দেখে মনে হতো পৃথিবী তাঁর চলার সাথে সাথে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। কখনো দ্রুত চললে পা দূরে দূরে রাখতেন। তবে সাধারণত মধ্যম গতিতে চলতেন। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রার ভাষায়, আমাদের পক্ষে তাঁর সাথে চলাই কষ্টকর হতো। তাঁর চলার ধরন ছিল সূরা লুকমানের 'যমীনের ওপর দিয়ে দম্ভভরে চলোনা' এই নির্দেশটির বাস্তব প্রতিফলন।" (মানবতার বন্ধু মুহম্মদ রাসূলুল্লাহ (স.) পৃষ্ঠা: ৭৯)

আমরা জানি, বড়াই করার অহমিকা যদি মানব দেহে থেকে থাকে তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। ব্যক্তির চাল-চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটি তুলে ধরে। ধন দৌলত, ক্ষমতা কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং তদনুরূপ অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির বাস্তব রূপ ব্যক্তির চাল চলনে ফুটিয়ে উঠে, পক্ষান্তরে চাল চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোনো না কোনো দূষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। এজন্যই হযরত লুকমান (আ.) তাঁর প্রিয় সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছে - وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

(নিজের চলনে ভারসাম্য আনো) অর্থাৎ, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল ও যুক্তিসঙ্গত ভদ্র লোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোনো অহংকার ও দম্ভ এবং কোনো দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আজমায়ীনদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) পথ চলা অবস্থায় দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে লোকটির বলা হলো- ইনি একজন কারী (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদাত করার মধ্যে মশগুল থাকেন) এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'ওমর ছিলেন কারীদের নেতা কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল, পথ চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন, যখন মারধর করতেন খুব জোরে শোরেই মারধর করতেন।" (তাফহীমুল কোরআন)

মুমিনের মর্যাদা

একজন মুমিনের মধ্যে ইমানের পূর্ণতা আসার পর আল্লাহতায়ালা তাকে যেসব পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন তা হলো-

মুমিনের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ

অভিভাবক হিসাবে আল্লাহকে পাওয়া। মহা ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ যখন কারও দায়িত্ব নিয়ে নেন, তখন তার আর কিইবা সমস্যা হতে পারে? দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগৎ তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহই মুমিনের সর্বোত্তম অভিভাবক। আল্লাহর এই অভিভাবকত্বের ব্যাপারে মুমিন কোনো সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করে না। কেননা এটা বিশ্বাসের অংশ। আল্লাহর অভিভাবকত্বের ব্যাপারে যার বিশ্বাস যত দৃঢ় সে আল্লাহর তত বেশি অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৭)

ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিকরা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার 'ওয়ালা' বা অভিভাবকত্বের যে সম্পর্ক আছে তার স্বরূপ তুলে ধরেন এভাবে—বান্দা সেই কথা, কাজ ও বিশ্বাসের ধারক হবে, যা তার প্রতিপালক ভালোবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। এরই অংশ হিসেবে সে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও দ্বীন ইসলামকে ভালোবাসবে, তাঁর প্রতি সাহায্য করবে, তাঁদের আদেশ ও নিষেধ মান্য করবে। প্রতিদানে আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

এ জন্য আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশে বলেন, 'জেনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই; এটাই মহাসাফল্য।' (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ৬৪)

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে মুমিন পরস্পরের অভিভাবক।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে; তাদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।’ (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৭১)
অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনরা।’ (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৫৫)

আর সৃষ্টিজগতে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুমিনদের জন্য সর্বোত্তম অভিভাবক। এ জন্য বলা হয়েছে, ‘নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।

’

(সুরা : আহজাব, আয়াত : ৬)

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও তাঁর অভিভাবকত্বের অধীন হওয়ার মাধ্যমে মুমিন যখন পরস্পর একতাবদ্ধ হয়, তখন আল্লাহ তাদের বিজয় চূড়ান্ত করেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে।’ (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৫৬)

প্রশান্ত হৃদয় দান

মুমিনদের হৃদয় শীতল ও সতেজ থাকে। আল্লাহতায়ালা বলেন, (যারা প্রকৃত মুমিন আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর সত্যিকার অর্থে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি এসে থাকে। (সূরা আর র’দ, আয়াত-২৮)।

বিপদ-আপদ, রাগ, ক্ষোভ ও ভয় মানুষের ভেতর অস্থিরতা তৈরি করে। মানসিক অস্থিরতা মানুষকে অবসন্ন এবং তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। মানুষের ভেতর হতাশার জন্ম দেয়। আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস মানুষকে এই অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

ঈমানই মানসিক অস্থিরতার উত্তম প্রতিষেধক এবং মানসিক প্রশান্তি মুমিনের প্রতি আল্লাহর উপহার। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমানের সঙ্গে ঈমান দৃঢ় করে নেয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীগুলো আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ (সুরা ফাতাহ, আয়াত : ৪)

মুমিনের হৃদয়ে ঈমান যত প্রজ্জ্বল হবে, তার মানসিক অস্থিরতাও তত কম হবে; বরং অন্যকে অস্থির হতে দেখলে, সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

এই মর্মে ইরশাদ হয়েছে, ‘সে তাঁর সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ন হইয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দ্বারা, যা তোমরা দেখোনি। তিনি অবিশ্বাসীদের কথা হেয় করেন। আল্লাহর কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

’ (সুরা তাওবা, আয়াত : ৪০)

ঈমানের পর আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি তৈরি করে। যেমনটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার কাছে বাইআত গ্রহণ করে। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদের তিনি দান করেন প্রশান্তি এবং উপহার দেন আসন্ন বিজয়।

’ (সুরা ফাতাহ, আয়াত : ১৮)

বিপরীতে অবিশ্বাস ও পাপাচার মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করে। ইরশাদ হয়েছে, ‘যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা—অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসুল ও মুমিনদের স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন। আর তাদের তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।’ (সুরা ফাতাহ, আয়াত : ২৬)

ইবাদতের মাধ্যমে যেমন অন্তরে প্রশান্তি আসে, তেমনি প্রশান্ত হৃদয়ে ইবাদত করাও আবশ্যক। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যখন নামাজ শুরু হয়, তখন দৌড়ে গিয়ে নামাজে যোগদান করবে না; বরং হেঁটে গিয়ে যোগদান করবে। নামাজে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামাতের সঙ্গে নামাজ যতটুকু পাও আদায় করো, আর যা ছুটে গেছে, পরে তা পূর্ণ করে নাও।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৯০৮)

শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) বলেন, প্রশান্তি হলো অন্তরের অস্থিরতা ও হতাশার বিপরীত বিষয়। মানসিক প্রশান্তির প্রতিফলন বান্দার বাহ্যিক অবয়বের ওপরও পড়ে। তখন বান্দার কথা ও কাজে অস্থিরতা থাকে না। নিঃসন্দেহে প্রশান্তির মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন। (শরহু রিয়াজুস সালিহিন : ৪/৯০)

মুমিনরাই জান্নাতের একমাত্র হকদার

জান্নাত মুমিনের চূড়ান্ত ঠিকানা। আল্লাহর সান্নিধ্য বা দিদারে ধন্য হতেই মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাত মুমিনের অতিরিক্ত পুরস্কার।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

অর্থ: "হে নবী! মুমিনদের সুসংবাদ দিন যে, আল্লাহর তরফ থেকে তাদের জন্যে অনেক অনুগ্রহ রয়েছে"। [সূরা আহযাব ৩৩:৪৭]

আর এই অনুগ্রহরাজির মধ্যে সর্বোচ্চ অনু অনুগ্রহ হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ ও জান্নাতের সর্বোত্তম হকদার হওয়া এবং এটাই মুমিনদের আসল সফলতা।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ: "এই মুমিন পুরুষ-নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন। যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান, চিরকাল তারা তা উপভোগ করবে, এই চির সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্যে রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর এ হবে তাদের বড় সাফল্য"। [সূরা আত তাওবা-৭২]

সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً

অর্থ: "সৎ কর্মশীল মুমিনদের আমি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। চিরকাল তারা তা উপভোগ করবে সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গী নারীও রয়েছে। আমি তাদের ঘন নিবিড় ছায়ার আশ্রয়দান করব"। [সূরা নিসা ৪:৫৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ: "এরাই হচ্ছে সেই উত্তরাধিকারী তারা ফেরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে"। [সূরা মু'মিনুন ২৩:১১]

প্রকৃত মুমিনরা জান্নাতের মেহমান। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, অবশ্যই যেসব লোক ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের মেহমানদারি করার জন্য ফিরদাউসের সুসজ্জিত বাগান রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। কখনো সেখান থেকে বের হতে চাইবে না। (সূরা আল কাহফ, আয়াত; ১০৭-১০৮)

পৃথিবীর রাজত্ব দান করেন

প্রকৃত মুমিনরা জমিনের কর্তৃত্ব লাভ করবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে, তোমাদের মধ্যকার সত্যিকার মুমিন ও সৎ কর্মশীলদের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমনি দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী মুমিনদের। (সূরা আন নূর, আয়াত-৫৫)।

মুমিনরাই বিজয়ী জাতি

সত্যিকার মুমিনরা দুনিয়া ও আখিরাতের একমাত্র সফলকাম জনগোষ্ঠী। মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের সফলতার পাশাপাশি দুনিয়াতেও বিজয় দান করার ঘোষণা দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থ: "আর তোমরা নিরাশ হইয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে"। [সূরা ইমরান ৩:১৩৯]

সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব

মুমিনরা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহতায়ালা বলেন, যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। যারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। (সূরা আল বায়্যিনাহ, আয়াত : ৭-৮)।

যার ইমান নেই সে ক্ষতিগ্রস্ত

প্রকৃত ইমানদার ছাড়া সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, শপথ মহাকালের! নিশ্চয়ই সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ইমান এনেছে, সৎ আমল করেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সূরা আল আসর, আয়াত ১-৩)।

মুমিনের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা

বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব বোঝাতে ও নিশ্চয়তা প্রদানে ওয়াদা বা অঙ্গীকারের আশ্রয় নেওয়া হয়। এই ওয়াদা বা অঙ্গীকার দুজন মানুষের মধ্যে যেমন হয়, তেমনি আল্লাহ ও মুমিনের মধ্যেও হয়। আল্লাহ তায়ালাও মুমিনদের প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াদা করেছেন এবং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, 'তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।' আল্লাহ যে ওয়াদাই করেন তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করেন। এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত এমন কিছু ওয়াদার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

দোয়া কবুলের ওয়াদা : আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি ওয়াদা করেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো (আমার কাছে দোয়া করো), আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (দোয়া কবুল করব।)' (সুরা গাফের : ৬০)

শেষ নবীর উম্মতের বিশেষ মর্যাদার কারণে দোয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়েছে। আগের যুগে শুধু নবী-রাসুলদেরই বলা হতো, দোয়া করুন, আমি কবুল করব। কিন্তু এ উম্মতের বেলায় এ আদেশ ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। এটি এই উম্মতের বিশেষ সম্মাননা।

বান্দাকে স্মরণের ওয়াদা : আল্লাহ তায়ালার আরেকটি অঙ্গীকার হলো, 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণে রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' (সুরা বাকারা : ১৫২)। আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে-তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ করো, তা হলে আমিও তোমাদের সওয়াব ও মাগফিরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব। মূলত আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে সব কাজেই আল্লাহর নির্দেশের কথা স্মরণ করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহর জিকিরই করে না। তাই যে আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখবে আল্লাহও তাকে স্মরণে রাখবেন।

নেয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা : আল্লাহ তায়ালার আরেকটি অঙ্গীকার হলো, 'ওই সময়ের কথা স্মরণ করো, তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, যদি তোমরা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে তোমাদের নেয়ামত আর বাড়িয়ে দেব' (সুরা ইবরাহিম : ৭)। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, যদি আমার নেয়ামত আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করো এবং নিজেদের পদক্ষেপ আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা করো, তা হলে আমি এসব নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নেয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে।

ক্ষমা করার ওয়াদা : আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষিত আরেকটি অঙ্গীকার হলো, 'আল্লাহ এমন নন যে তারা ক্ষমা চাইবে অথচ আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন' (সুরা আনফাল : ৩৩)। এ আয়াতে আল্লাহর শাস্তি আসার পথে একটি অন্তরায়ের কথা বলা হয়েছে, তা হলো ক্ষমা প্রার্থনাকারী এক দল লোকের উপস্থিতি। আল্লাহ তায়ালা অঙ্গীকার করেছেন, যদি কোনো এলাকায় মুত্তাকি-পরহেজগার ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী এক দল লোক থাকেন, আল্লাহ তায়ালা সেখানে শাস্তি দেবেন না। যাবতীয় বিপদ-মুসিবত থেকে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করবেন, যদি তার কাছে নিজের ভুলের জন্য তওবা করে ক্ষমা চাওয়া হয়।

একজন ইমানদার প্রকৃত মুমিন হলে সে ইমানের স্বাদ পাবে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ইবাদতে অনেক বেশি প্রশান্তি পাবে। মন্দ ও অশালীন কাজের প্রতি অনীহা তৈরি হবে। মুখে আল্লাহর জিকির ও হৃদয়ে আল্লাহর ভয় নিয়ে তার দিনাতিপাত ঘটবে। দুনিয়া হবে তার জন্য জান্নাতের বাগান আর পরকালে পাবে সে সম্মান, মর্যাদা সুখ অফুরান। মহান আল্লাহ সবাইকে প্রকৃত মুমিন হয়ে ওঠার তাওফিক দান করুন।

সংগ্রহ (মুমিনের গুণাবলী, মাওলানা আবুল হোসাইন
মুমিনের বৈশিষ্ট্য, মাওলানা সালেহ মাহমুদ
(মাওলানা মাহাদী হাসান, মুফতি মুহাম্মদ মুর্তজা,) গুগল